সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ১৪তম আয়াত সংখ্যাঃ (১১১-১১৮)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللِّ مِنُ الشّيْطَانُ الرّجِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۗ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۙ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ ৯ : ১১১

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের হক ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য।

উপরোক্ত আয়াতে ১৩ নববী বর্ষে হজ্জের মওসুমে (১২ই যিলহাজ্জ) মক্কায় অনুষ্ঠিত বায় 'আতে কুবরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত বায় 'আতে ইয়াছরিব থেকে আগত ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী শরীক ছিলেন। বায় 'আতের পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার প্রভুর জন্য ও আপনার নিজের জন্য শর্ত পেশ করুন। তখন তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের জন্য এই শর্ত পেশ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আমার নিজের জন্য শর্ত করছি যে, তোমরা আমাকে হেফাযত করবে ঐসব বস্তু থেকে যেসব থেকে তোমরা নিজেদের জান ও মাল হেফাযত করে থাক' । তারা বলল, এতে আমাদের কি লাভ যদি আমরা এগুলো করি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত' । তখন তারা বলল, 'ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না' । তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয় (ইবনু জারীর হা/১৭২৭০; কুরতুবী হা/৩৪৯৪; ফাতহুল বারী ৬/৪; ইবনু কাছীর ৪/২১৮, সনদ হাসান লিগাইরিহী)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন কথার উপরে আপনার নিকটে বায় 'আত করব? তিনি বললেন, (১) সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও তা মেনে চলবে (২) কষ্টে ও সচ্ছলতায় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করবে (৩) সর্বদা ন্যায়ের আদেশ

দিবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহর জন্য কথা বলবে এভাবে যে, আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি ইয়াছরিবে তোমাদের কাছে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা নিজেদের ও নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাযত করে থাক, সেভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমরা 'জান্নাত' লাভ করবে' (আহমাদ হা/১৪৪৯৬; ছহীহাহ হা/৬৩; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২১২-২১৬ পৃঃ)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জান ও মালকে জান্নাতের মূল্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যখন আল্লাহর পথে বান্দা স্বীয় জীবন ও সম্পদ ব্যয় করবে, তখন সে মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব সম্পন্ন করল। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সাথে এ চুক্তি করলেন এবং তাকে বিভিন্ন প্রকার তাকীদ দ্বারা দৃঢ় করলেন। যথা:

প্রথম : এ ঘোষণা বিবৃত করার ক্ষেত্রে إِنَّ ব্যবহার করেছেন, যা বাক্যকে দৃঢ় করণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় : ماضى তথা অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায়, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়ে গেছে।

তৃতীয়: উক্ত লেনদেন স্বয়ং নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বিক্রেতা।

চতুর্থ : তিনি এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, সে মূল্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে। আর এমন এক প্রতিশ্রুতি যা ভঙ্গ করা হবে না এবং তার বিপরীতও করা হবে না।

পঞ্চম : এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা ব্যক্তির উপর সাধারণত: আবশ্যকতা সাব্যস্ত করা হয়। তিনি বলেন, وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا অর্থাৎ, তিনি নিজের জন্যে তা আবশ্যকীয় করে নিলেন।

ষষ্ঠ: শুধু وَعْدًا বলে ক্ষান্ত করেননি; বরং عَلَيْهِ حَقًّا এ ও ব্যবহার করেছেন। প্রতিশ্রুতিকে আরো দৃঢ় করে।

সপ্তম: তিনি বলেন, তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয়টি তাঁর অবতারিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে উদ্ধৃত রয়েছে।

অষ্টম : তিনি وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِى أَوْفِي بِعَهْدِكُمْ বলে إنكارى استفهام তথা অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন ব্যবহার করে বান্দাকে এ কথা জানিয়ে দিলেন, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকারী অন্য কেউ নেই।

নবম : তিনি বান্দাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা এ চুক্তিতে আনন্দিত হও। যারা এ চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে ও যাদের জন্য চুক্তি অবাধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে তোমরা সুসংবাদ দাও। কেননা, এটা এমন একটি চুক্তি যা লংঘন করার বা রহিত করার কোন পদ্ধতি নেই।

দশম : তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে যে সওদা করেছ, তা হল মহা সাফল্য। এখানে بَيْع দ্বারা উদ্দেশ্য হল مبيع তথা বিক্রয়-যোগ্য মাল অর্থাৎ জান্নাত, যা তোমরা জান-মালের বিনিময়ে লাভ করেছ। আর بايعتم به এর অর্থ হল ثامنتم به - তোমরা যার মূল্য পরিশোধ করেছ।

• লেনদেন বা সওদা: এই আয়াতে মুমিনদের জীবনযাপন ও ঈমানকে আল্লাহর সাথে এক ধরনের চুক্তিমূলক বিক্রয় বা লেনদেনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বান্দা তার জান ও মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এবং এর চূড়ান্ত প্রতিদান হিসেবে জান্নাত লাভ করে।

· আগের কিতাবসমূহের ঘোষণা: এই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি কেবল পবিত্র আল-কুরআনেই নয়, বরং এর আগের আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলেও দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

· মহাসাফাল্য: আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এই ত্যাগ ও অঙ্গীকারকে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা ও 'আল-ফাওযুল আজিম' বা মহাসাফল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা-বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটি চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দা তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, মরার পর পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা-বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায় মানুষের ধন-প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ তিনিই তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করেছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোন প্রশ্নেই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোন জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোর্পদ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (**Free will and freedom of choice**)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যই প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায় এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে তার নিজের প্রাণের নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সঙ্গে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেরই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা-বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা-বেচা এ অর্থে নয় যে,

মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোর্পদ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মানুষের দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নাও)। এ সঙ্গে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মু' মিন। ঈমান আসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা-বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা-বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী। কেনা-বেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাকঃ

এক এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দু' টি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন।

প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ের নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তার পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তার প্রতি আছে কিনা।

দুইঃ যে ফিকাহর আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ার ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোন বিচারক কাউকে অমু' মিন বা ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তার সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায-রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে, কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের নিজের মন, মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির নিজের ধন-সম্পদ, উপায়, উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের

মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মু' মিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যই অমু' মিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারে ইমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আদতে কোন কেনা-বেচার কাজই করেননি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা-এ দু' টি কার্য ধারাই চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেয় যে, ইমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের মনে করেছে

তিনঃ ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা-বেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যই ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তার শরয়ী আইনের বিধিনিষেধ মুক্ত হয়ে কোন নীতি পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে জানতে পারবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবোনা করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যই একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা মুসলমান নামে আখ্যায়িত হোক বা অমুসলিম নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

চারঃ এ কেনা-বেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছা নয় বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র

জীবনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনা-বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা-বেচার অন্তনিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য (অর্থাৎ জান্নাত।) দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনা আপনিই বুঝে আসে। বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে কেবলমাত্র এ অঙ্গীকারের বিনিময়েই যে জান্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে। এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল ও শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা-বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এ বিষয় গুলো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেবার সাথে সাথে এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোন প্রেক্ষাপটে **** এ বিষয়বস্তুটির অবতারণা হয়েছে তাও জেনে নেয়া উচিত। ওপর থেকে যে ধারাবাহিক ভাষণ চলে আসছিল তাতে এমন সব লোকের কথা ছিল যারা ঈমান আনার অঙ্গীকার করেছিল ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার কঠিন সময় সমুপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে আন্তরিকতার অভাবে এবং অনেকে চূড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করার ফলে আল্লাহর ও তার দ্বীনের জন্য নিজের সময় ধন সম্পদ স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতস্তত করেছিল। কাজেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর আচরণের সমালোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছো তা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেবার নাম নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন-সম্পদের মালিক ও অকাট্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ঈমান। কাজেই এ অঙ্গীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হুকুমে কুরবানী করতে ইতস্তত করো এবং অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়-উপকরণ সমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অঙ্গীকার মিথ্যা। সাচ্চা ঈমানদার একমাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জান-মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে এবং তাকেই এ সবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে নির্দ্বিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগন্যতম অংশও ব্যয় করতে রাজী হয় না।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও। [বাগভী] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন হয়ে যান যিনি তাঁর রাস্তায় বের হয়। তাকে শুধুমাত্র আমার রাহে জিহাদই এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাসই বের করেছে। আল্লাহ্ তার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যদি সে মারা যায় তবে তাকে জান্নাত দিবেন অথবা সে যা কিছু গনীমতের মাল পেয়েছে এবং সওয়াব পেয়েছে তা সহ তাকে তার সে ঘরে ফিরে পৌছিয়ে দিবেন যেখান থেকে বের হয়েছে। [বুখারী: ৩১২৩; মুসলিম: ১৮৭৬]।

সূরা আস-সফ (৬১: ১০-১১): এই আয়াতে আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের এই লেনদেনকে একটি লাভজনক "ব্যবসা বা বাণিজ্য" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!"

জামে আত-তিরমিযী (সর্বোত্তম ব্যবসা):রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:"জেনে রেখো, আল্লাহর পণ্য অত্যন্ত মূল্যবান। জেনে রেখো, আল্লাহর পণ্য হলো জান্নাত।" (জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৫০)

সূরা আল-বাকারা (২: ২০৭):এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"

সূরা আল-আনআম (৬: ১৬২):একজন মুমিনের জীবন ও মরণ যে সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য, তা এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে।"বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।"

• বুখারী ও মুসলিম (জান্নাতের বিনিময়ে জিহাদ):

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হলো—আর আল্লাহ ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথে বের হয়—সে যেন আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। যদি সে মারা যায়, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি সে (গাজী হয়ে) ফিরে আসে, তবে প্রতিদান ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ ফিরে আসবে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

· সহীহ বুখারী (শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা):

আয়াতটিতে বলা হয়েছে মুমিনরা "মারে ও মরে"। এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই এবং আবার শহীদ হই।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯৭)

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۹ : ۱۱۲
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ • وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ

১১২. তারা তাওবাহকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূ’ কারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; আর আপনি মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দিন।

এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে- ‘আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন’ । আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। তবে এখানে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ, আল্লাহর রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। [কুরতুবী]

মূল আয়াতে التَّائِبُونَ(আত্ তা-য়েবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় তাওবাকারী। কিন্তু যে বর্ণনা রীতিতে ও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা করা ঈমানদারদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে তারা কেবলমাত্র একবার তাওবা করে না বরং সবসময় তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। কাজেই এ শব্দটির মূল প্রাণ সত্তা প্রকাশ কারার জন্য এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ- তারা আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসে। মু’ মিন যদিও তার পূর্ণ চেতনা ও সংকল্প সহকারে আল্লাহর সাথে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ কেনা-বেচার কারবার করে কিন্তু যেহেতু বাইরের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই অনুভূত হয় যে, প্রাণ তার নিজের এবং ধন ও তার নিজের আর তাছাড়া এ প্রাণ ও ধনের আসল মালিক মহান আল্লাহ। কোন অনুভূত সত্তা নন বরং একটি যুক্তিগ্রাহ্য সত্তা। তাই মু’ মিনের জীবনের বারবার এমন সময় আসতে থাকে যখন সে সাময়িকভাবে আল্লাহর সাথে করা তার কেনা-বেচার চুক্তি ভুলে যায়। এ অবস্থায় এ চুক্তি থেকে গাফেল হয়ে সে কোন লাগামহীন কার্যকলাপ করে বসে। কিন্তু একজন প্রকৃতও যথার্থ মু’ মিনের

বৈশিষ্ট্য এই যে, এ সমায়িক ভুলে যাওয়ার হাত থেকে যখনই সে রেহাই পায়, তখনই নিজের গাফলতির পর্দা ছিড়ে সে বেরিয়ে আসে এবং অনুভব করতে থাকে যে, অবচেতনভাবে সে নিজের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছে তখনই সে লজ্জা অনুভব করে, তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা চায় এবং নিজের অঙ্গীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়। এ বারবার তাওবা করা, বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং প্রত্যেকটি পদস্খলনের পর বিশ্বস্ততার পথে ফিরে আসাই ঈমানের স্থিতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নয়তো যেসব মানবিক দুর্বলতা সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর উপস্থিতিতে তার পক্ষে এটা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর হাতে একবার ধন-প্রাণ বিক্রি করার পর চিরকাল পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এ কেনা-বেচার দাবী পূরণ করতে থাকবে এবং কখনো গাফলতি ও বিস্মৃতির শিকার হবে না। তাই মহান আল্লাহ মু’ মিনের এ সংজ্ঞা বর্ণনা করেন না যে, বন্দেগীর পথে এসে কখনো যার পা পিছলে যায় না সে মু’ মিন। বরং বার বার পা পিছলে যাবার পরও প্রতিবারই সে একই পথে ফিরে আসে, এটিকেই আল্লাহ মু’ মিনের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মানুষের আয়ত্বের ভেতরের শ্রেষ্ঠতম গুণ।

আবার এ প্রসঙ্গে মু’ মিনের গুণাবলীর মধ্যে সবার আগে তাওবার কথা বলার আর একটি উপযোগিতাও রয়েছে। আগে থেকে যে ধারাবাহিক বক্তব্য চলে আসছে তাতে এমনসব লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যাদের থেকে ঈমান বিরোধী কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই তাদেরকে ঈমানের তাৎপর্য ও তার মৌলিক দাবী জানিয়ে দেবার পর এবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মু’ মিনের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছেঃ যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যায় তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেদিকে ফিরে আসে। নিজেদের সত্য বিচ্যুতির ওপর যেন অবিচল হয়ে দাড়িয়ে না থাকে এবং পিছনের দিকে বেশী দূরে চলে না যায়।

- মূল ইবারতে السَّائِحُونَ(আস সায়েহুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন الصَّائِمُون (আস সা-য়েমুন) অর্থাৎ যারা রোযা রাখে। কিন্তু السَّائِحُونَ আস সায়েহুনা বা বিচরণকারীকে রোযাদার অর্থে ব্যবহার করলে সেটা হবে তার রূপক ও পরোক্ষ অর্থ। এর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ এটা নয়। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী (সা.) নিজেই এ শব্দটির এ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন সেটিকে নবীর ﷺ ওপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। তাই আমরা একে এর প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাকেই বেশী সঠিক মনে করি। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইসফাক শব্দটি সরল ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এর মানে হয় ব্যয় করা এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ঠিক তেমনি এখানে

বিচরণ করা মানেও নিছক ঘোরাফেরা করা নয়। বরং এমন উদ্দেশ্যে যমীনে চলাফেরা করা, যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। যেমন, দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কুফর শাসিত এলাকা থেকে হিরজত করা, দীনের দাওয়াত দেয়া, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, পরিছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা , আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা উপার্জন করা। এ গুণটিকে এখানে বিশেষভাবে মু’ মিনদের গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ জন্য যে, যারা ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও জিহাদের আহবানে ঘর থেকে বের হয়নি তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সত্যিকার মু’ মিন ঈমানের দাবী করার পর নিজের জায়গায় আরামে বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহর দীন গ্রহণ করার পর তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিন মুজাহিদের আটটি গুণ উল্লেখ করে নবম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে “আর আল্লাহর দেয়া সীমারেখার হেফাযতকারী” মূলতঃ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরীআতের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

অর্থাৎ মহান আল্লাহ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তামাদ্দুন অর্থনীতি-রাজনীতি আইন-আদালত এবং যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন তারা তা পুরোপুরি মেনে চলে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড এ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছা মতো কাজ করতে থাকে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনের বা মানুষের তৈরী ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। এছাড়াও আল্লাহর সীমারেখা গুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এগুলো লঙ্ঘন করতে দেয়া যাবে না। কাজেই সাচ্চা ঈমানদারদের সংজ্ঞা কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা নিজেরা আল্লাহর সীমা মেনে চলে বরং তাদের অতিরিক্ত গুণাবলী হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেগুলো অটুট রাখার জন্য নিজেরদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

ইসলামী শরিয়ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। হালাল ও হারামের সীমারেখা আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যেন মানুষ সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝে চলতে

পারে। মহনবী (সা.) হাদিসে হালাল, হারাম ও সন্দেহজনক বিষয়ের পার্থক্য তুলে ধরেছেন এবং অন্তরের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

নু’মান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছিঃ অর্থাৎ- বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, রাবী বলেন; (এ সময় নু’মান তার আঙ্গুল দুটি দ্বারা কানের দিকে ইশারা করেন, নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না।

যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। জেনে, রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে।

যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হলো ’কালব’ হৃদয়। (সহিহ মুসলিম হাদিস: ১৫৯৯)

হাদিসের ব্যাখ্যা

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: ‘এটি ইসলামের একটি অন্যতম দিকনির্দেশনামূলক হাদিস।

এতে জানানো হয়েছে যে, কোরআন ও সুন্নাহতে বহু বিষয় স্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম বলে নির্ধারিত।’ (শরহ মুসলিম, নববী, ১১/২৭) হালাল মানে: যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) স্পষ্টভাবে অনুমোদন করেছেন। হারাম মানে: যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) ﷺ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। এই দুয়ের মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থতা নেই। যেমন—নামাজ, সাদকা, হালাল খাদ্য; আর হারাম হলো—মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি।

সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ (الشبهات)

এগুলো এমন বিষয়, যার বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে অজানা থাকে—যেমন, কোনো খাবার বা আয় হালাল না হারাম তা নিশ্চিত নয়। ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন: ‘এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো আলেমদের কাছে পরিষ্কার, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য তা অস্পষ্ট। তাই নবী (সা.) তাদের সাবধান করেছেন যাতে তারা নিজেদের দ্বীন রক্ষা করতে পারে। (ফাতহুল বারী, ১/১২৭)

ইমাম নববী বলেন: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহভীরুতার কারণে সন্দেহজনক জিনিসও ত্যাগ করে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদ রাখে।’

(শরহ মুসলিম)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এ বিষয়ে বলেন: ‘যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে, সে আসলে আল্লাহর ‘সংরক্ষিত সীমানা’ থেকে দূরে অবস্থান করছে—এটাই তাকওয়ার পরিপূর্ণতা।(ই ‘লামুল মুওয়াক্কি ‘ইন, ১/৪৩)

রাসুল (সা.) উদাহরণ দিয়েছেন একজন রাজা ও তার সংরক্ষিত এলাকার। যেমন রাখাল যদি সীমার কাছে পশু চরায়, একসময় পশুগুলো ভিতরে ঢুকে পড়বেই।

ইবনু রজব আল-হানবলী (রহ.) বলেন: ‘এই উপমার মাধ্যমে মহানবী (সা.) বোঝাতে চেয়েছেন—যে ব্যক্তি হারামের কাছাকাছি যায়, সে অবশেষে তাতে পতিত হতেই পারে। তাই তাকওয়ার প্রকৃত অর্থ হলো দূরত্ব বজায় রাখা।’ (জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, হাদীস নং ৬)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ৯ : ১১৩

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।

এই আয়াতের তফসীর সহীহ বুখারীতে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন নবী (সাঃ) তার নিকট গেলেন। তার নিকট আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যাহ বসেছিল। নবী (সাঃ) বললেন, ‘‘চাচাজান! ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ে নিন, যাতে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য প্রমাণ পেশ করতে পারি। আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যাহ বলল, ‘‘হে আবু তালেব! (মৃত্যুর) সময় আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে?’’ (শেষে ঐ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হল।) নবী (সাঃ) বললেন, ‘‘যতক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ না করা হবে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।’ তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হল, যাতে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (সহীহ বুখারী) এবং সূরা ক্বস্বাস্বের ৫৬নং আয়াত (إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ) আয়াতটিও এই মর্মে অবতীর্ণ হয়েছে। ‘‘আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছে

সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন''। সূরা ক্বস্বাস্ব ৫৬নং

মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় আছে যে, একদা নবী (সাঃ) তাঁর মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ আহমদ ৫ম খন্ড ৩৫৫পৃঃ) আর নবী (সাঃ) নিজ সম্প্রদায়ের জন্য যে দু' আ করেছিলেন, (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ) ''হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা অজ্ঞ। তা এই আয়াতের বিরোধী নয়। কারণ এই দু' আর অর্থ হল তাদের জন্য হিদায়াত কামনা করা। অর্থাৎ তারা আমার মর্যাদা ও সম্মান থেকে বেখবর, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দাও, যাতে তারা ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায়। আর জীবিত কাফের ও মুশরিকের জন্য হিদায়াতের দু' আ করা বৈধ।

কোন ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আবেদন জানানোর অনিবার্য অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে ভালবাসি। আমরা তার দোষকে ক্ষমা যোগ্য মনে করি। যারা বিশ্বস্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং শুধুমাত্র গোনাহগার তাদের ক্ষেত্রে এ দুটো কথাই ঠিক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তাকে ভালবাসা ও তার অপরাধকে ক্ষমা যোগ্য মনে করা শুধু যে নীতিগতভাবে ভুল তাই নয় বরং এর ফলে

- আমাদের নিজেদের বিশ্বস্ততা ও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে।
- আর যদি শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বলে আমরা তাকে মাফ করে দিতে চাই তাহলে এর মানে হবে, আমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার দাবীর তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান। আল্লাহ ও তার দ্বীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল ও শর্তহীন নয়।
- আল্লাহ দ্রোহীদের সাথে আমরা যে সম্পর্কে জুড়ে রেখেছি তার ফলে আমরা চাচ্ছি, আল্লাহ নিজেও যেন এ সম্পর্ক গ্রহণ করেন এবং আমাদের আত্মীয়কে যেন অবশ্যই ক্ষমা করে দেন, যদিও এ একই অপরাধ করার কারণে অন্যান্য অপরাধীদেরকে তিনি জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে থাকেন।
- বস্তুত এ সমস্ত কথাই ভুল আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার বিরোধী এবং সেই একনিষ্ঠ ঈমানের পরিপন্থী যার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও তার দ্বীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল হতে হবে, আল্লাহর বন্ধু হবে আমাদের বন্ধু এবং তার শত্রু হবে আমাদের শত্রু। এ কারণে মহান আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, তোমরা মুশরিকদের জন্য মগফিরাতের দোয়া করো না। বরং তিনি বলেছেন তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না। অর্থাৎ আমার মানা করায় যদি তোমরা বিরত থাকো তাহলে তো এর তেমন

কোন গুরুত্ব থাকে না। মূলত তোমাদের মধ্যে আনুগত্যও বিশ্বস্ততার অনুভূতি এত বেশী তীব্র হওয়া উচিত যার ফলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের সাথে সহানুভূতির সম্পর্ক রাখা এবং তাদের অপরাধকে ক্ষমা যোগ্য মনে করা তোমাদের নিজেদের কাছেই অশোভন ঠেকে।

এখানে আরো এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ দ্রোহীদের প্রতি যে সহানুভূতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা কেবলমাত্র এমন পর্যায়ের সহানুভূতি যা দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মানবিক সহানুভূতি এবং পার্থিব সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক এবং স্নেহ-সম্প্রীতি পূর্ণ ব্যবহার এসব নিষিদ্ধ নয় বরং প্রশংসনীয়। আত্মীয় কাফের হোক বা মু’মিন, তার সামাজিক অধিকার অবশ্যই প্রদান করতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সকল অবস্থায় সাহায্য দিতে হবে। অভাবীকে যে কোন সময় সহায়তা দান করতে হবে। রুগ্ন ও আহতের সেবা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে কোন ত্রুটি দেখানো যাবে না। ইয়াতীমের মাথায় অবশ্যই স্নেহের হাত বুলাতে হবে। এসব ব্যাপারে কখনো মুসলিম ও অমুসলিমের বাচবিচার করা চলবে না।

অন্য বর্ণনায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে, তিনি বলেন, এক লোককে তার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা চাইতে দেখলাম। অথচ তারা ছিল মুশরিক। আমি বললাম, তারা মুশরিক হওয়া সত্বেও তুমি কি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছ? সে বলল, ইবরাহীম কি তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযী]

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ ۠ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۹ : ১১৪
اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ • عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ

১১৪. আর ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইবরাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।

হযরত ইবরাহীম তার মুশরিক পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় যে কথা বলেছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেনঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

আপনার প্রতি সালাম, আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে দোয়া করবো যেন তিনি আপনাকে মাফ করে দেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। (মারয়ামঃ ৪৭)তিনি আরো বলেছিলেনঃ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

আমি আপনার জন্য অবশই ক্ষমা চাইবো। তবে আপনাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই। (আল মুমতাহিনাঃ ৪)

উপরোক্ত ওয়াদার ভিত্তিতে তিনি নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করেছিলেনঃ

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ - وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ - يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ -

আর আমার পিতাকে মাফ করে দাও, তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর যেদিন সকল মানুষকে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারোর কোন কাজে লাগবে না। একমাত্র সেই নাজাত পাবে, যে আল্লাহর সামনে হাযির হবে বিদ্রোহ মুক্ত হৃদয় নিয়ে। (আশ শুআরাঃ ৮৬-৮৯)

এ দোয়া তো প্রথমত অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত ভাষায় করা হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষনেই হযরত ইবরাহীম চিন্তা করলেন যে, তিনি যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করেছেন সে তো ছিল প্রকাশ্য আল্লাহ দ্রোহী এবং আল্লাহর দ্বীনের ঘোরতর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত হলেন এবং একজন যথার্থ বিশ্বস্ত মু’ মিনের মত বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো থেকে পরিষ্কারভাবে সরে দাঁড়লেন। অথচ এ বিদ্রোহী ছিল তার পিতা, যে এক সময় স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাকে লালন পালন করেছিল।

(أواه) শব্দটির অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত এসেছে। ইবন মাসউদ ও উবাইদ ইবন উমায়রের মতে এর অর্থ, বেশী বেশী প্রার্থনাকারী। হাসান ও কাতাদা বলেন, এর অর্থ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি বেশী দরদী। ইবন আব্বাস বলেন, এটি হাবশী ভাষায় মুমিনকে বোঝায়। কালবী বলেন, এর অর্থ যিনি জনমানবশূণ্য ভূমিতে আল্লাহকে আহবান করে। কারও কারও মতে, বেশী বেশী যিকিরকারী। কারও কারও মতে, ফকীহ।

আবার কারও কারও মতে বিনয়ী ও বিনম্র। কারও কারও মতে, এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে নিজের গোনাহের কথা স্মরণ হলেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কারও কারও মতে এর অর্থ, যিনি আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা থেকে সর্বদা প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। কারও কারও মতে এর অর্থ, যিনি কল্যাণের কথা মানুষদের শিক্ষা দেন। তবে এ শব্দটির মূল অর্থ যে বেশী বেশী আহ্ আহ্ বলে কোন গোনাহ হয়ে গেলে আফসোস করতে থাকে। মনে ব্যথা অনুভব হতে থাকে এবং এর জন্য তার মন থেকে আফসোসের শব্দ হতে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

মূলে اواه(আওওয়াহুন) ও حَلِيْمٌ (হালীমুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আওওয়াহুন মানে হচ্ছে, যে অনেক বেশী হা-হুতাশ করে, কান্নাকাটি করে, ভয় পায় ও আক্ষেপ করে।

আর হালীম এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের মেজায সংযত রাখে, রাগে, শত্রুতায় ও বিরোধিতায় বেসামাল আচরণ করে না এবং অন্যদিকে ভালবাসায়, বন্ধুত্বের ও হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে যায় না। এখানে এ শব্দ দু' টি দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করছে। হযরত ইবরাহীম (আ) তার পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় বৃত্তির অধিকারী। তার পিতা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে, একথা ভেবে তিনি কেঁপে উঠেছিলেন। আবার তিনি ছিলেন "হালিম" -সংযমী ও ধৈর্যশীল। তার পিতা ইসলামের পথে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বাধা দেবার জন্য তার ওপর যে জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল তা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে পিতার জন্য দোয়া বের হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন, তাই তিনি তার থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিলেন। কারণ তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন এবং কারোর প্রতি ভালোবাসায় সীমা অতিক্রম করতেন না।

اِنَّ اللّٰهَ • بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۚوَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا ۱۱۵ : ۹ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

১১৫. আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হিদায়াত দানের পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন–যতক্ষন না তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, যা থেকে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে তা; নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

লোকদের কোন চিন্তা কার্যধারা ও পদ্ধতি থেকে বাঁচতে হবে তা আল্লাহ আগেই বলে দেন। তারপর যখন তারা তা থেকে বিরত হয় না এবং ভুল চিন্তা ও কাজে লিপ্ত হয়ে তার ওপর অবিচল থাকে তখন আল্লাহও তাদের হেদায়াত করার ও সঠিক পথ নির্দেশনা দেয়া থেকে বিরত হন এবং যে ভুল পথে তারা যেতে চায় তার ওপর তাদেরকে ঠেলে দেন।

এ বক্তব্যটি থেকে একটি মূলনীতি অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় হেদায়াত দেয়া ও গোমরাহ করাকে তার নিজের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো এ মূলনীতিটির মাধ্যমে ভালভাবে বুঝে যেতে পারে। আল্লাহর হেদায়াত দেয়ার মানে হচ্ছে, তিনি নিজের নবী ও কিতাসমূহের সাহায্যে লোকদের সামনে সঠিক চিন্তা ও কর্মধারা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তারপর যারা স্বেচ্ছায় এ পথে চলতে উদ্যোগী হয় তাদের চলার সুযোগ ও সামর্থ্য দান করেন। আর আল্লাহর গোমরাহীতে লিপ্ত করার মানে হচ্ছে তিনি যে সঠিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন যদি তার বিপরীত পথে চলার জন্য কেউ জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সোজা পথে চলতে না চায় তাহলে আল্লাহ জোর করে তাকে সত্য পথ দেখান না এবং সত্যের দিকে চালিত ও করেন না বরং যেদিকে সে নিজে যেতে চায় সেদিকে যাবার সুযোগ ও সামর্থ্য তাকে দান করেন।

আলোচ্য ভাষণটি একথাটি কোন প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, আগের ও পরের ভাষণ গুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজেই বুঝা যেতে পারে। এটা এক ধরনের সতর্কবাণী। একে অত্যন্ত সঙ্গত ভাবে আগের বর্ণনার সমাপ্তি হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। আবার পরে যে আলোচনা আসছে তার ভূমিকা ও বলা যেতে পারে।

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۝ ৯ : ১১৬

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ, আসমান ও যমীনের মালিকানা তাঁরই তিনি জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

• সূরা আল-বাকারাহ (আয়াত ২৫৫ - আয়াতুল কুরসী): "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক... আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর..."

· সূরা আল-মুলক (আয়াত ১-২): "বরকতময় তিনি যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে– কর্মে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম?"

· সূরা আল-আ'রাফ (আয়াত ১৫৮): "...তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর এবং তাঁর রাসূলের ওপর..."

২. আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক ও সাহায্যকারী

· সূরা আল-বাকারাহ (আয়াত ১০৭): "তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।"

· সূরা আশ-শূরা (আয়াত ৯): "তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক স্থির করেছে? আসলে আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক। আর তিনি মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"

· সূরা আলে ইমরান (আয়াত ১৬০): "আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের ওপর জয়ী হওয়ার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে?"

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ۝ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۝ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ৯ : ১১৭

১১৭. আল্লাহ অবশ্যই নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটময় মুহূর্তে- তাদের এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন; নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।

তাবুক যুদ্ধের সফরকে 'সঙ্কটমুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ
প্রথমতঃ তখন গ্রীষ্মকাল ছিল।
দ্বিতীয়তঃ ফসল কাটার সময় ছিল।
তৃতীয়তঃ অনেক দূরের সফর ছিল।
চতুর্থতঃ সফরের সম্বলও ছিল অতি অল্প। ফলে এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদেরকে (جَيش العُسرَة) (সঙ্কটকালের সেনা) বলা হয়।

এ যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে ইবন আব্বাস উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। আমরা এক স্থানে অবস্থান নিলাম। আমাদের পিপাসার বেগ প্রচণ্ড হল।

এমনকি আমরা মনে করছিলাম যে, আমাদের ঘাঁড় ছিড়ে যাবে। এমনকি কোন কোন লোক পানির জন্য বের হয়ে ফিরে আসত, কিন্তু কিছুই পেত না। তখন পিপাসায় তার ঘাড় ছিড়ে যাবার উপক্রম হতো। এমনকি কোন কোন লোক তার উট যবাই করে সেটার ভূড়ি নিংড়ে তা পান করত। আর কিছু বাকী থাকলে সেটা কলজের উপর বেঁধে রাখত। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো দেখেছি, আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করলে কল্যাণ লাভ করি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দোআ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি তা চাও? আবু বকর বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু' হাত উঠালেন। হাত গোটানোর আগেই একখণ্ড মেঘ আমাদের ছায়া দিল এবং সেখান থেকে বৃষ্টি পড়ল। সবাই তাদের সাথে যা ছিল তা পূর্ণ করে নিল। তারপর আমরা অবস্থা দেখতে গেলাম, দেখলাম যে, আমাদের সেনাবাহিনীর বাইরে আর কোন বৃষ্টি নেই। [ইবন হিব্বান: ১৩৮৩]

حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ • وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ৯ : ১১৮
اِنَّ اللّٰهَ • ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا • عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

১১৮. আর তিনি তাওবা কবুল করলেন অন্য তিনজনেরও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না যমীন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সেটা সংকুচিত হয়েছিল এবং

তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা নিশ্চিত উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তাওবাহ কবুল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

নবী (সা.) যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন যারা পিছনে অর্থাৎ মদীনায় থেকে গিয়েছিল। তারা ওযর পেশ করার জন্য হাজির হলো। তাদের মধ্যে ৮০ জনেরও বেশী ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর পেশ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ(সা.) তা মেনে নিচ্ছিলেন। তারপর এলো এ তিন জন মু' মিনের পালা। তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। নবী (সা.) তাদের তিনজনের ব্যাপারে ফয়সালা মুলতবী রাখলেন।

তিনি সাধারণ মুসলমানদের হুকুম দিলেন, আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। এ বিষয়টির ফয়সালা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (এখানে একথাটি অবশ্যই) সামনে রাখতে হবে যে, ৯৯ টীকায় যে সাতজন সাহাবীর আলোচনা এসেছে তাদের ব্যাপারটি কিন্তু এদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা তো জবাবদিহির আগেই নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দিয়েছিলেন।

এরা তিন জন হলেন কা'আব ইবন মালেক, মুরারা ইবন রবি এবং হেলাল ইবন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁরা তিনজনই ছিলেন আনসারদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বাই' আতে আকাবা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো তারপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোর্পদ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারা ও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না।

কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিস্কার ভাষায় তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে অপরাধের সাজা স্বরূপ তাদের সমাজ চ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত

অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সুরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, এ আয়াতটি তাঁদের তাওবাহ কবুল হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন। [এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তাবারী; বাগভী; ইবন কাসীর প্রমূখগণ বর্ণনা করেছেন]